গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ১৬ - ২২ ডিসেম্বর ২০২২ www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ৩ টাকা

জন্মশতবর্ষে
কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

“কমিউনিস্ট হওয়ার সাধনা একটি কঠিন সাধনা। এই বিপ্লবী রাজনীতি হচ্ছে একটা সর্বব্যাপক আন্দোলন যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলোকে ‘ইন্টিগ্রেট’ করে, অর্থাৎ সংযোজিত করে গড়ে ওঠে। এই ইন্টিগ্রেশনটি ঘটাতে পারলে তবেই সর্বহারা বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব।”

কেন ভারতবর্ষের মাটিতে
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) একমাত্র সাম্যবাদী দল

সাম্প্রতিক নির্বাচন প্রমাণ করল বিজেপি-ঝড় বলে কিছু নেই

দিল্লি এবং হিমাচল প্রদেশে বিজেপির পরাজয় প্রমাণ করল নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহদের সাংগঠনিক কৌশল, ক্ষমতা প্রভৃতি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে যত প্রচারই থাকুক বাস্তবে তা সত্য নয়— বিজেপি অপরাজেয় নয়, ‘মোদি ম্যাজিক’ বলে প্রচারিত কোনও অলৌকিক ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেই। সত্যিই যদি এ-সব থাকত তবে দিল্লি এবং হিমাচলে বিজেপি এ ভাবে মুখ থুবড়ে পড়ত না, সাতটি উপনির্বাচনের পাঁচটিতেই হারত না।

গুজরাট পুনর্দখলের জন্য বিজেপি নেতারা যেমন জান কবুল করেছিলেন, ঠিক একই রকম ভাবে জান কবুল করেছিলেন দিল্লি এবং হিমাচল পুনর্দখলের জন্য। দিল্লিকে নিজেদের কব্জায় রাখার জন্য বিজেপি অনেক আগে থেকেই ঘুঁটি সাজিয়েছিল। দিল্লির তিনটি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলকে বিজেপি এবার জুড়ে একটিই কর্পোরেশনের এক্তিয়ারভুক্ত করে যাতে গুজরাট এবং হিমাচলের সাথে একই মোদি ম্যাজিকে গোটা দিল্লিরও দখল তাদের হাতে থেকে যায়। এই লক্ষ্য থেকে তাঁরা দিল্লি কর্পোরেশন নির্বাচনেও গুজরাটের মতোই প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে সভা করিয়েছে। দিল্লিতে সংগঠিত দাঙ্গা, সংখ্যালঘুদের উপর বর্বর আক্রমণের পর তাদের বিরুদ্ধেই দাঙ্গা লাগানোর অভিযোগ এনে তাদের গ্রেফতার করে জেলে ভরা প্রভৃতি নানা ভাবে মেরুকরণের চেষ্টা, বিরোধীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে ইডি-সিবিআইকে দিয়ে হেনস্থা করা প্রভৃতি কোনও কিছুই দিল্লি পুরসভায় বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভকে ঢাকতে পারেনি।

হিমাচলেও ঠিক একই রকম ভাবে মোদি নিজে গিয়ে একের পর এক সভা করেছেন, গুজরাটের কায়দাতেই বলেছেন, কোনও বিশেষ প্রার্থীকে নয়, তিনিই সব আসনে প্রার্থী হয়েছেন ধরে নিয়ে জনগণ যেন বিজেপিকে ভোট দেয়। কিন্তু সবই বিফলে গেছে। অগ্নিবীর প্রকল্পের নামে সেনাবাহিনীর চাকরিতে চার বছরের চুক্তিতে নিয়োগের বিরুদ্ধে যুবসমাজের বিক্ষোভ, দাম না পাওয়া আপেল চাষিদের বিক্ষোভ কোনও কিছুকেই নেতাদের শুকনো প্রতিশ্রুতিতে মুছে দেওয়া যায়নি। বিজেপির এই পরাজয় প্রমাণ করল, বিজেপি তথা প্রধানমন্ত্রীর ডবল ইঞ্জিনের তত্ত্বও যে আসলে ভুয়ো, তা বুঝতে দেশের মানুষের অসুবিধা হয়নি। মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতা কিনেছে শত সহস্র কোটি টাকা ছড়িয়ে এমএলএ কেনার মাধ্যমে।

তা হলে বিজেপি গুজরাটে জয়ী হল কী করে? বাস্তবে এ বার গুজরাট নির্বাচনটা ছিল একদিকে বিজেপি, গুজরাট সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মিলিত শক্তি এবং অন্য দিকে নেতৃত্বহীন, ছন্নছাড়া কংগ্রেস এবং সংগঠনহীন আপের মধ্যে। গুজরাটে ১৯৯৫ থেকে টানা ২৭ বছর রাজত্ব করছে বিজেপি। নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের

দুয়ের পাতায় দেখুন

দর্শন বলতে কী বুঝি

তিনের পাতায়

সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধের শপথ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ছাত্র কনভেনশনে

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ প্রতিরোধ আন্দোলনের অংশ হিসেবে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ভারতের জ্বলন্ত শিক্ষা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ‘রেজিস্ট এনইপি-২০২০’ এবং ‘সেভ পাবলিক এডুকেশন’-এর আহ্বানে ৯ ডিসেম্বর আসামে গুয়াহাটির জেলা গ্রন্থাগার হলে এআইডিএসও-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ঐতিহাসিক উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ছাত্র কনভেনশন।

সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে সহস্রাধিক ছাত্র প্রতিনিধির বিপুল উৎসাহ ও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে অদম্য উদ্দীপনা ছিল লক্ষণীয়। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড ভি এন রাজশেখরের উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কনভেনশনের সূচনা হয়। তিনি গণশিক্ষাকে বাঁচাতে এআইডিএসও-র নেতৃত্বে দেশব্যাপী ব্যাপক ছাত্র

ছাত্র কনভেনশনে বক্তব্য রাখছেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ ঘনশ্যাম নাথ

চারের পাতায় দেখুন

হারার ভয়ে মেডিকেল কলেজে নির্বাচন আটকাচ্ছে তৃণমূল

কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের স্বৈরাচারী রূপ আবারও একবার প্রকাশ্যে এল। দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে দফায় দফায় ছাত্র আন্দোলন চলছিল, যে আন্দোলনের অংশীদার এআইডিএসও কর্মীরাও। আন্দোলনের চাপে কলেজ কর্তৃপক্ষ ২২ ডিসেম্বর ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দিন ধার্য করে। কিন্তু ৫ ডিসেম্বর কলেজ কাউন্সিলের মিটিং চলার সময় জানানো হয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্বাচন স্থগিত করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের এই নির্দেশ কলেজের স্বায়ত্তশাসনের উপরে একটা মারাত্মক আঘাত।

বিজেপির হাতের পুতুল ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের দেখানো পথে দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূল সরকার ক্রমশ মেডিকেল কলেজগুলির স্বাধিকার খর্ব করছে। একমাত্র এআইডিএসও ছাড়া সমস্ত ছাত্র সংগঠন এ ব্যাপারে নীরব। ২০১২ সালে এসএসকেএম মেডিকেল কলেজে (আইপিজিএমআর) একই

আটের পাতায় দেখুন

বিজেপি-ঝড় বলে কিছু নেই

একের পাতার পর

অপদার্থতা, ব্যাপক দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি প্রভৃতি মিলিয়ে জনগণের ক্রমাগত বাড়তে থাকা ক্ষোভের কথা বিজেপি নেতৃত্বের ভালই জানা ছিল। তাঁদের এ-ও ভাল করেই জানা ছিল যে, গুজরাটে বিজেপির পরাজয় মানেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে যে সুপারম্যান ভাবমূর্তি বিজেপি নেতারা শত-সহস্র কোটি টাকা ব্যয় করে সংবাদমাধ্যমকে

গুজরাটে বিধায়কদের
৮৩ শতাংশ কোটিপতি,
২২ শতাংশ অপরাধে অভিযুক্ত

গুজরাট বিধানসভার জয়ী নতুন বিধায়কের সংখ্যা ১৮২ জন। এর প্রতি ১০ জন বিধায়কের ৮ জনই (৮৩ শতাংশ) বহুকোটি টাকার মালিক। প্রতি ১০ জন বিধায়কের মধ্যে ২ জন (২২ শতাংশ) বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) এই তথ্য প্রকাশ করেছে।

(টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১২.১২.২২)

কাজে লাগিয়ে কৃত্রিমভাবে গড়ে তুলেছেন তা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়া। ফলে গুজরাট নির্বাচন প্রেস্টিজ ইসু ছিল বিজেপির কাছে। বিজেপি নেতৃত্বের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে দেশ জুড়ে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচতে গুজরাটে তাঁদের যে কোনও ভাবে জিততে হবে। অর্থাৎ গুজরাট নির্বাচনে জয়ী হওয়াটা লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে যুক্ত। নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহরা এটাও পরিষ্কার বোঝেন যে, গুজরাট নির্বাচনে পরাজিত হলে, দেশ জুড়ে জনমনে যে ক্ষোভ বিজেপি শাসনের বিরুদ্ধে জমা হয়েছে, তার আরও বিস্ফোরণ ঘটবে। তাই গুজরাটে জিততে তাঁরা জান কবুল করেছিলেন। জয় ছিনিয়ে আনার জন্য যা করা প্রয়োজন তা করতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন—কার্যত কোনও রাস্তাই বাকি রাখেননি।

তাই মুখ্যমন্ত্রী পদে মুখবদল করতে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে বিজয় রূপাণিকে সরিয়ে ভূপেন্দ্র পটেলকে নিয়ে আসা হয়। জনমনে ইমেজ ভাল না থাকায় গতবার জেতা ৪২ জন বিধায়ককে এ বার নির্বাচনে প্রার্থী করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত ছ'মাস ধরে গুজরাটে কার্যত ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেছেন। রাজ্য এবং কেন্দ্র উভয় সরকারকে দিয়ে অজস্র প্রকল্প ঘোষণা করেছেন, অজস্র শিলান্যাস করেছেন। কেন্দ্র ও রাজ্যের গোটা প্রশাসনকে বিজেপি নেতাদের নির্বাচনী প্রচারে কাজে লাগানো হয়েছে। হিমাচল এবং গুজরাট উভয় নির্বাচনেই যাতে প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট সময় দিতে পারেন, তাই অন্যায় ভাবে নির্বাচন কমিশনকে বাধ্য করা হয়েছে গুজরাট নির্বাচনকে পিছিয়ে দিতে। অমিত শাহ নিজে দায়িত্ব নিয়েছেন গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ার পরিচালনার। তারপরও বিজেপি নেতারা নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। উস্কে তুলেছেন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে, কাজে লাগিয়েছেন মেরুকরণকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ্য জনসভায় গুজরাট গণহত্যার উল্লেখ করে সংখ্যালঘুদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

এই সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিজেপির নীতিহীন নির্বাচনী কৌশল। সারা দেশের মতোই গুজরাট জুড়েও জাতপাত-ধর্মবর্ণের বিভেদকে পুরোমাত্রায় কাজে লাগিয়েছে বিজেপি। পাতিদারদের ক্ষোভকে স্তিমিত করতে যেমন ভূপিন্দর পটেলকে মুখ্যমন্ত্রী করেছে, তেমনই যে হার্দিক পটেল এবং অল্পেশ ঠাকুর পিছিয়ে পড়া মানুষদের দাবি তুলে ধরে তাদের নেতা হিসাবে উঠে এসেছিলেন, নানা কৌশলে তাঁদের দলে নিয়ে এসে সেই পিছিয়ে পড়া মানুষদের ভোট কবজা করেছে।

সংবাদমাধ্যম গুজরাট নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রিভিউ লেখার সময় বারবার দেখিয়েছে সাধারণ মানুষ কতটা অসহায়। হিন্দু-মুসলমান, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ নির্বিশেষে ছোট ব্যবসায়ী, খেটে খাওয়া মানুষ একবাক্যে বলেছেন বিজেপি শাসন তাঁদের দুর্দশা বাড়িয়েছে। একই সঙ্গে তাঁরা বলেছেন, এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এমন শক্তি কোথায়? কংগ্রেস এবং আপ যারা বিজেপির বিরোধী বলে পরিচিত, তারা জনগণের দাবি নিয়ে কোথাও আন্দোলন গড়ে তোলেনি। দু'দলই বিজেপির পাল্টা রাজনীতি বলতে নরম বা গরম হিন্দুত্বেরই আশ্রয় নিয়েছে। দুই পক্ষের নেতারাই মন্দিরে মন্দিরে ঘুরেছেন। এমনকি অমিত শাহ সরাসরি গুজরাট গণহত্যার জন্য আস্ফালন করলেও হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক হারানোর ভয়ে কংগ্রেস কিংবা আপ কেউ তার বিরুদ্ধে মুখ খোলেনি। আপ যাদের প্রার্থী করেছিল তাদের অনেকেই আবার বিজেপির দরজায় লাইন দিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। ফলে অসহায় মানুষ বিকল্প রাজনীতি খুঁজলেও তা পাননি।

গুজরাটে এক এসইউসিআই (সি) ছাড়া অন্য বামপন্থী দলগুলি বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব কার্যত ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। অসহায় মানুষ ক্ষোভ জানিয়েছেন, কিন্তু সুরাহার পথ পাননি। ফয়দা তুলেছে বিজেপি।

নির্বাচনী প্রচারে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার জীবনের আসল দাবিগুলি। এই বুর্জোয়া নির্বাচন সম্পর্কেই বহু দিন আগে এ যুগের অন্যতম মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ দেখিয়ে গিয়েছেন, নির্বাচন আসলে একটি বুর্জোয়া রাজনীতি। সরকারি দলগুলি যখন তাদের বিরাট টাকার থলি, পেশিশক্তি নিয়ে নির্বাচনে নামে, পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমগুলি যখন সমস্বরে তাদের প্রচার দিতে থাকে, তখন জনসাধারণ সেই প্রচারে উলুখাগড়ার মতো ভেসে যায়। গুজরাট নির্বাচনে ঠিক সে জিনিসটিই ঘটেছে। বিজেপি সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের প্রবল ক্ষোভ সত্ত্বেও বিপুল প্রচারে বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, দারিদ্রের মতো জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি কার্যত ভেসে গিয়েছে।

আবার হিমাচলে বা দিল্লিতে যে বিজেপি পরাজিত হয়েছে তার দ্বারা জনগণের দাবিগুলিই জয়ী হয়েছে—এমনটাও একেবারেই নয়। বুর্জোয়াদেরই পাল্টাপাল্টির রাজনীতিতে জনগণ বোড়ে হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এই ফল প্রমাণ করেছে যে বিজেপি কোনও অপ্রতিরোধ্য শক্তি নয়। মানুষ শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ালে তাকে অনায়াসেই পরাজিত করা যায়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপি কোনও অপরাজেয় শক্তি নয়।

তবু যতক্ষণ না জনগণ তাদের জীবনের দাবিগুলি নিয়ে লড়াই তথা গণআন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে সংগ্রামের কমিটি গড়ে তুলে নিজস্ব শক্তির জন্ম দিতে পারছে তত দিন পুঁজিপতিদেরই একটি দলের বদলে আর একটি দল জনগণের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে বসবে। জনগণও একটি দলের পরিবর্তে আর একটি দলকে নির্বাচিত করতে বাধ্য হয়ে বুর্জোয়া রাজনীতির ফাঁদে পড়ে প্রতারিত হতে থাকবে।

বিজেপির সর্বভারতীয় চরিত্রের স্বরূপ

২৯টি রাজ্যের মধ্যে মাত্র ৬টিতে বিজেপির স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে।

অন্য দিকে বিজেপির সিকিমে আসন সংখ্যা ৩১-এর মধ্যে ১২, মিজোরামে ১টি, তামিলনাড়ুতে ৪টি, অন্ধ্রে ১৭৫টির মধ্যে ০, কেরালায় ১৪০টির মধ্যে ০, পাঞ্জাবে ১১৭টির মধ্যে ২, বাংলায় ২৯৪টির মধ্যে ৭৪, তেলেঙ্গানায় ১১৯-এর মধ্যে ৩, দিল্লিতে ৭০টির মধ্যে ৮, ওড়িশায় ১৪৭ এর মধ্যে ২২, নাগাল্যান্ডে ৬০টির মধ্যে ১২, বিহারে ২৪৩টির মধ্যে ৭৪।

যে রাজ্যগুলিতে বিজেপি জোট সরকার আছে সেখানে বিজেপির আসনের অবস্থান ঃ

মেঘালয়ে ৬০টির মধ্যে ২, জম্মু ও কাশ্মীরে ৮৭টির মধ্যে ২৫, গোয়ায় ৪০টি আসনের মধ্যে ১৩টি।

সারা দেশে মোট ৪১৩৯টি বিজেপির বিধানসভা আসনের মধ্যে ১৫১৬টি আসন রয়েছে যার মধ্যে ৯৫০টি আসন গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, ইউপি, এমপি, রাজস্থানের মতো ৬টি রাজ্যের।

এটা পরিষ্কার, বিজেপির কোনও ঢেউ বা ঝড় নেই। (সোসাল মিডিয়ায় প্রাপ্ত)

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এস ইউ সি আই (সি)-র বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার কুলতলীতে ভুবনেশ্বরী লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড সুভাষ মাইতি দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ১ ডিসেম্বর তাঁর নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর দাদা, শহিদ কমরেড সুযেন মাইতির অনুপ্রেরণায় তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথম দিন থেকেই তিনি দলের সমস্ত গণআন্দোলনের কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া শুরু করেন। সেই সময়ে, অর্থাৎ ১৯৮৯ সালে মৈপীঠে সিপিএম ঘাতক বাহিনী এস ইউ সি আই (সি)-র কর্মী-সমর্থকদের উপর ব্যাপক অত্যাচার চালাতে থাকে। দলের অত্যাচারিত কর্মীরা কমরেড সুভাষ মাইতির বাড়িতে এসে আশ্রয় নিতেন। তিনি সেইসব কমরেডদের চিকিৎসা, থাকা-খাওয়া সহ সমস্ত দায়িত্ব বহন করতেন। অন্য কমরেডরা যাতে অত্যাচারের শিকার না হন, সে জন্য তিনি মৈপীঠের কর্মীদের বুক দিয়ে আগলে রাখতেন। তাঁর এই ভূমিকায় ক্ষিপ্ত এলাকার সিপিএম নেতৃত্ব তাঁকে মিথ্যা মামলায় তিন মাস হাজতবাস করতে বাধ্য করে।

নিজের এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয় কমরেড সুভাষ মাইতি মানুষের যে কোনও সমস্যায় সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলীয় নেতা-কর্মীরা সহ এলাকার মানুষজন ও অন্যান্য দলের পক্ষ থেকে অনেকে এসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। দলের বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক কমরেড নন্দ কুণ্ডু, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোবিন্দ হালদার সহ জেলা কমিটির অন্য সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড সুভাষ মাইতি লাল সেলাম

কুলতলীর ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের দলের কর্মী কমরেড প্রশান্ত মণ্ডল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন ধরে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ৩ ডিসেম্বর ওই হাসপাতালেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।

কমরেড প্রশান্ত মণ্ডল কলেজে পড়াকালীন প্রথমে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র সংস্পর্শে আসেন। পরে এস ইউ সি আই (সি)-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। পরবর্তীকালে তিনি ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হন। শাসক দলের রক্তচক্ষুর সামনে কোনও দিন তিনি মাথা নত করেননি।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় নেতা-কর্মী সহ বহু সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকরাও।

কমরেড প্রশান্ত মণ্ডল লাল সেলাম

দর্শন বলতে কী বুঝি

'দর্শন'—এই কথাটাই সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ভয় মিশ্রিত, আবেগহীন শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তোলে। দর্শনের মতো গুরুগম্ভীর জটিল একটা বিষয় যে সাধারণ মানুষের জন্য নয়—এই ধারণাটা প্রায় সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যেই কমবেশি প্রচলিত আছে। সাধারণ মানুষ বড় জোর পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্বের মতো বিষয়গুলি নিয়ে একটু আধটু নাড়াচাড়া করতে পারে। কারণ এসব বিষয়গুলি তবু ধরাছোঁয়া যায়, বোঝা যায়। এমনতরো বিশেষ বিশেষ বস্তু সম্পর্কেই তারা আলোচনা করতে সক্ষম। কিন্তু দর্শন! সীমাহীন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যাহীন বিষয়বস্তু সম্পর্কে অন্তহীন তর্ক-বিতর্কের দিগ্বিদিকহীন এক গোলকধাঁধা—এ ছাড়া আর কী বা বলা যায় দর্শনকে?

দর্শন বিষয়টি যে সত্যিই কী—সে সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা দেওয়ার জন্য এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ও তত্ত্বগত ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্বকে যেমন নিজেদের কাজে লাগানো হয়, তেমনই দর্শন শাস্ত্রটিকেও আমাদের কোনও কাজে আমরা লাগাতে পারি কি না, সেটা দেখার জন্য বর্তমান আলোচনার অবতারণা।

দর্শন বলতে সাধারণ অর্থে আমরা বুঝি—'এই দুনিয়াটা কী রকম', 'মানুষ কী করে এল'? 'কী উদ্দেশ্যে এল'? 'জীবনের অর্থ কী'? ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন সম্পর্কে নানা মুনি যে নানা রকম মত জাহির করে গেছেন—তাই, এবং সত্যি সত্যিই এই নানা মুনির নানা মতের মধ্য দিয়ে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এমন জটিল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, এমনকি দর্শন শাস্ত্রের বিষয়বস্তুটা ঠিক কী, অথবা কোনও দর্শনের প্রকৃত অর্থ ঠিক কী—এ বিষয়ে দর্শনের অধ্যাপকরা পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে একটা মতৈক্যে এসে পৌঁছতে পারেননি। এত বহু বিচিত্র মত ও পথের গোলকধাঁধায় পড়ে তাই শেষপর্যন্ত সমস্ত লোকই—এ সম্পর্কে আর বিশেষ মাথা ঘামানো উচিত নয় স্থির করে যে যার নিজের নিজের আখের গোছানোর দিকে নজর দিয়েছে—ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ আশ্রয় নিয়েছে ভগবানের কোলের মধ্যে, সংশয়বাদীরা আত্মসমর্পণ করেছে জীবন-বিদ্বেষী আত্মসর্বস্বতার ধারণার কাছে, বিজ্ঞানী তার ল্যাবরেটরিতে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে, আর মুনাফাখোর ব্যবসায়ী তার লাভের অঙ্ক বাড়াবার দিকেই নজর দিয়েছে। দর্শনের মতো এত বড় একটা ব্যাপার, এত জটিল তত্ত্বের পিছনে নষ্ট করার মতো সময় কোথায় তাদের!

কিন্তু মানুষ, 'দর্শনকে' ছাড়তে চাইলেই বা দর্শন মানুষকে ছাড়ে কই? ওই সব অ-দার্শনিক লোক, যারা সযত্নে দর্শনের ছায়াটুকু পর্যন্ত পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে, তারা জানেও না যে তাদের এই কাজের মধ্যেও একটা দর্শন কাজ করে চলেছে। দর্শন হচ্ছে এমন একটা জিনিস, যা আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বর্তমান। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনযাপনের পথে, প্রতি দিন নানা ভাবে নানা দিক থেকে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং তার আশেপাশের আর পাঁচটা মানুষের সঙ্গে এক এক সময় এক এক ভাবে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়, সংঘর্ষ ও মিলনের সম্পর্ক স্থাপন করছে। তার নিজের সঙ্গে সমাজের এবং প্রকৃতির এই বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের মধ্য দিয়েই তার নানা রকমের ভাবনা, ধারণা, বিশ্বাস বা সংস্কার গড়ে উঠছে। এবং এর মধ্য থেকেই তার নিজের সম্পর্কে আর আশপাশের মানুষগুলি সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে, জীবন সম্পর্কে, এই দুনিয়া সম্পর্কে তার যে ধারণা গড়ে উঠছে তাই হচ্ছে দর্শনশাস্ত্রের প্রাথমিক ভিত্তি।

যেহেতু প্রত্যেক মানুষেরই এই সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে কিছু কিছু নিজস্ব ধারণা, ভাবনা, বিশ্বাস বা সংস্কার আছে এবং যেহেতু এই সমস্ত বিষয়গুলিই দর্শনশাস্ত্রের এক্তিয়ারভুক্ত, তাই এ সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই মনে হয়।

কিন্তু এই সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে প্রশ্নটা উঠবে, তা হচ্ছে, এই যে জীবন, সমাজ ও দুনিয়া সম্পর্কে এক একজন মানুষের এক একটা ব্যক্তিগত ধারণা বা চিন্তা—দর্শন বলতে কি কেবলমাত্র এইটুকুকেই বোঝায়, নাকি এর চাইতে বেশি কিছু বোঝায়? এর জবাব মিলবে দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস কিছুটা পর্যালোচনা করলে।

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকেরা বস্তুজগত সম্পর্কে তাদের নিজের নিজের ব্যক্তিগত ধারণা বা ব্যক্তিগত চিন্তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে কেউ কেউ বললেন, সৃষ্টির আদিতে ছিল জল, কেউ বললেন, জল নয়, বায়ু। আবার আর একজন বললেন, জলও নয়, বায়ুও নয়, সমস্ত বিশ্ব জগতের সৃষ্টির মূলে রয়েছে অগ্নি। এই তিন ব্যক্তির তিনটি চিন্তা পাশাপাশি ধরলে দেখতে পাব এগুলির কোনওটিই কারও ব্যক্তিগত খেয়ালি কল্পনা বা আন্দাজি ধারণা মাত্র নয়। কারণ এই তিনজনের তিনটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু এই পার্থক্যের চাইতেও তিনজনের মতৈক্যটাই বেশি লক্ষণীয়। প্রথম মতৈক্য, তিনজনেরই এক প্রশ্ন—বস্তুজগতের উৎস কী? তিন জনেরই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পিছনে সমকালীন চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ধারণা বর্তমান। যেমন প্রত্যেকেই এটা ধরে নিয়েছেন যে সারা দুনিয়ায় যত বিভিন্ন রকমের জড়পদার্থ বা জীবজন্তু দেখা যায় সেই সমস্তগুলিই কোনও সাধারণ মৌলিক বস্তু থেকে ক্রমাগত পরিবর্তনের পথে সৃষ্ট হয়েছে। আমাদের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে যেমন ক্ষিতি (পৃথিবী, মাটি), অপ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) এবং ব্যোম (শূন্য)— এই পাঁচটিকে প্রাথমিক পদার্থ বলে মনে করা হত তেমনি প্রাচীন গ্রিসের দর্শন শাস্ত্রেও এর প্রথম চারটিকে, অর্থাৎ মাটি, জল, অগ্নি এবং বায়ুকে মৌলিক পদার্থ বলে মনে করা হত। এঁরা তিনজনে তিনটি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে ওই চারটি মৌলিক পদার্থেরই কোনও না কোনওটিকে মূল পদার্থ বলে ধরে নিয়েছেন, তখনকার সমাজের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে যাননি। তিনজনের চিন্তাধারার এটা দুই নম্বর মিল।

তৃতীয় মতৈক্য দেখতে পাওয়া যায় এঁদের একটা সাধারণ ধারণার মধ্যে যে, একই সাধারণ মৌলিক পদার্থ থেকে আজ যে এই বহুবিধ জড় ও জীবের আবির্ভাব ঘটেছে, এটা ঈশ্বর বা অন্য কোনও দেবদেবীর মর্জি বা খেয়ালখুশিতে ঘটেনি, প্রকৃতি জগতের একাধিক নিয়ম-নীতি অনুসরণ করেই একটিমাত্র মৌলিক পদার্থের মধ্য থেকে ক্রমাগত পরিবর্তনের পথে দুনিয়ার যাবতীয় জড় ও জীবের আবির্ভাব ঘটেছে।

এই তিন প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকের বক্তব্য যত অস্পষ্ট বা অগোছালোই হোক না কেন, একটা কথা খুব স্পষ্ট যে এঁদের তিনজনের ধারণার প্রভেদ যতটুকু, মিল ছিল তার তুলনায় অনেক বেশি। পরবর্তী কালের দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলেও আমরা দেখতে পাব যে অপেক্ষাকৃত জটিলতর এবং যুক্তিবহুল দার্শনিক চিন্তাধারাগুলির শেষ সিদ্ধান্তগুলি যতই পরস্পরবিরোধী হোক না কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই কতগুলি সাধারণ প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার চেষ্টা হয়েছে। কাজেই বিভিন্ন দার্শনিকের বিভিন্ন চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্তের পার্থক্যের মধ্য দিয়ে 'দর্শন কী' তা বোঝার চেষ্টা না করে বিভিন্ন দার্শনিকের বাস্তবতা বা সত্য সম্পর্কে একই ধরনের প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে তা বুঝতে গেলে তার চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা হবে।

একই অভিজ্ঞতার উপরে দাঁড়িয়ে একই প্রশ্নের উত্তরে এক এক দার্শনিক এক এক রকম সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছেছেন। এর কারণ কী? ইতিহাসকে সতর্কভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে নিছক যুক্তি-তর্ক বা নিছক ঘটনার উপর ভিত্তি করেই এই সমস্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তের পার্থক্য ও বিভেদের সৃষ্টি হয়নি, বরং সমাজের অভ্যন্তরে পরস্পরবিরোধী শক্তির সংঘাত, পরস্পরবিরোধী ভাবনা ধারণার অস্তিত্বই একই প্রশ্নের মীমাংসায় এক একজন দার্শনিককে এক এক দিকে ঠেলে দিয়েছে। যে বিশেষ যুগে যে বিশেষ সামাজিক পরিবেশে দার্শনিকের জন্ম, যে বিশেষ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে যে গোষ্ঠী বা শ্রেণির মধ্যে তাঁর অবস্থান, সেই বিশেষ কালের, সেই বিশেষ সমাজের সেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে যদি আমরা লক্ষ না করি, তা হলে তাঁর সেই বিশেষ সিদ্ধান্ত—যা অন্য অনেক দার্শনিকের সিদ্ধান্তের বিরোধী—তার উৎপত্তির কারণও আমরা খুঁজে বের করতে পারব না।

সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পটভূমিকা একেবারে অগ্রাহ্য করে যদি আমরা কোনও দার্শনিককে বিচার করতে যাই তা হলে আরও একটা কথা খুঁজে বের করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হবে। যে ভাবে প্রাচীন দার্শনিকেরা বাস্তব জগতের চার দেওয়ালের মধ্যেই তাঁদের প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন পরবর্তী কালের দার্শনিকেরা কেন আর সেই পূর্বপ্রদর্শিত পথ অনুসরণ করলেন না? কেন তাঁদের দর্শনচর্চা বিজ্ঞানের সঙ্গে ক্রমশই সম্পর্ক কাটিয়ে আনল। কেন তাঁদের দর্শনচর্চা পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র বা জীববিজ্ঞানের থেকে আলাদা হয়ে বাস্তব জগতের সঙ্গে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণ আলাদা একটা শাস্ত্র হিসাবে কখনও এগুলির সমর্থনে কখনও এগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বাধীন স্বতন্ত্র বিজ্ঞান নিরপেক্ষ 'দর্শনশাস্ত্রে' পরিণত হল?

মানবসভ্যতার ইতিহাসের পটভূমিকায়, আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের জীবনের সামগ্রিক পরিবর্তনের পটভূমিকায় রেখে যদি দর্শনের ইতিহাসকে বিচার করি, তা হলে দুটো সত্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে বেরিয়ে আসে।

প্রথমত, দর্শন অর্থে কোনও কালেই নিস্পৃহ, নিরাসক্ত, নিঃস্বার্থ সত্যানুসন্ধান বোঝায়নি।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক দর্শনই হয় প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ভাবনা-ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কারকে সমর্থন করেছে, নয় এগুলির বিরুদ্ধতা করেছে।

এইভাবে প্রত্যেকটি দর্শনকে যদি বিচার করি তা হলেই আমরা সেগুলির যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারব। নইলে এই ঐতিহাসিক পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে গেলে কোনও দর্শনেরই উৎপত্তির ইতিহাস, উৎপত্তির কারণ এবং তাৎপর্য আমার বুঝতে পারব না।

দর্শন শাস্ত্রের আগাগোড়া ইতিহাস লক্ষ করলে দেখতে পাওয়া যাবে, দুটি প্রশ্ন সেখানে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথম এবং প্রধান প্রশ্ন, 'অন্তিম সত্য কী' (অর্থাৎ কিসের উপর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু এবং সমস্ত ঘটনা নির্ভরশীল) — বস্তু না ভাব? এক দলের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থের, অর্থাৎ জড়, জীব, মানুষ অথবা মানুষের সমাজ, মানুষের মন তথা চিন্তাজগত এ সব কিছুরই আবির্ভাব ঘটেছে বস্তু থেকে। এখানে বস্তু বলতে কোনও বিশেষ একটি বস্তুকে বোঝায় না, সাধারণ ভাবে নির্বিশেষ বস্তু বোঝায়। আবার আর এক দলের মতে আইডিয়া বা ভাবই হচ্ছে সমস্ত কিছুর মূলে। এখানে 'ভাব' বলতে কোনও বিশেষ ব্যক্তির ভাবনা বা চিন্তা বা আদর্শকে বোঝায় না, ভাব বলতে বোঝায় ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, বস্তু-নিরপেক্ষ, কোনও স্বয়ম্ভু (সেল্ফ এগজিসটেন্ট) নিয়ম-নীতি বা আদর্শের আদি অন্তহীন শাশ্বত, সনাতন চিন্তা ব্যবস্থাকে। এ 'ভাব' মানুষের মস্তিষ্কের বাইরে, ছাপার অক্ষরে লেখা বইয়ের বাইরে, মনে করে রাখা স্মৃতির বাইরে, আমাদের এই ধরা-ছোঁয়ার জগতের বাইরে, ব্যক্তি নিরপেক্ষ, বস্তু নিরপেক্ষ ভাবে স্বয়ম্ভু অবস্থায় বিরাজমান। এ 'ভাবের' অস্তিত্ব স্থান-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে।

দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা উঠেছে— নিত্যতা বা অনিত্যতার মধ্যে কোনটি সত্য? যা স্থায়ী, যা ধ্রুব, যা চিরন্তন বা নিত্য, সেটাই সত্য, নাকি, যা অস্থায়ী, যা স্বল্পকালীন, যা সাময়িক, বা অনিত্য সেটা সত্য?

এই দু'টি প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে যে, দু'টি প্রশ্নের মধ্য থেকেই দর্শন এবং বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটি প্রকট হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞান কী করে? বিজ্ঞান প্রকৃতিজগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে ভর (মাস) ও শক্তির (এনার্জি) বিভিন্ন রূপের কি পরিবর্তন ঘটছে, কেন ঘটছে কী ভাবে ঘটছে তার হদিশ বাতলায় এবং

আটের পাতায় দেখুন

কোচবিহার জেলায় তুফানগঞ্জের চিলাখানায় ৬ ডিসেম্বর রাসায়নিক সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে এআইকেকেএমএস-এর তুফানগঞ্জ-১ ব্লক সম্পাদক কমরেড অশ্বিনী কুমার বর্মনের নেতৃত্বে চাষিরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন

মধ্যপ্রদেশে প্রকল্প-কর্মীদের বিক্ষোভ

মহাত্মা গান্ধী গ্রাম সেবা যোজনায় কর্মরত কর্মীদের বকেয়া বেতন ও ভাতা অবিলম্বে মেটানোর দাবিতে এআইইউওয়াইও-র উদ্যোগে মধ্যপ্রদেশে বিক্ষোভ। ২৫ নভেম্বর

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন গুজরাটে

১০ ডিসেম্বর গুজরাটের আমেদাবাদে 'মুভমেন্ট ফর সেকুলার ডেমোক্রেসি' (এমএসডি) বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন করল। 'মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং সকলের ন্যায়বিচার'-এর আহ্বান নিয়ে দিনটি উদযাপিত হয়। সংগঠনের আহ্বায়ক প্রকাশভাই এন শাহ, সম্পাদক দ্বারিকানাথ রথ, অধ্যাপক হেমন্তকুমার শাহ, সারাবেন বলদিওয়ালা, নিতা মহাদেব, মীনাক্ষী যোশী, রথীন দাস, মহাদেব বিদ্রোহী, রিমি বাঘেলা, মুদিতা বিদ্রোহী, ডঃ রঙ্গরাজন রাঘবন, তনুশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মানবাধিকার আন্দোলনের ৭৫তম বর্ষপূর্তিতে দলিত, মহিলা, সংখ্যালঘু, শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী মানুষের অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন তাঁরা। 'হাম হোঙ্গে কামিয়াব' গানের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শেষ হয়।

কোলাঘাটে কৃষক বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে সাগরবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কয়েকটি মৌজার প্রায় ৫০০ একর আমন ধানের জমিতে জমে থাকা জল অবিলম্বে বের করার দাবিতে ২৮ নভেম্বর এলাকার কৃষকরা কৃষক সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে কোলাঘাট বিডিও এবং দেনান সেচ দপ্তরের অফিসে বিক্ষোভ দেখান। পরদিন সেচ দপ্তরের এসডিও এলাকা পরিদর্শনে আসতে বাধ্য হন। কৃষকরা দাবি করেন, অবিলম্বে খালের মজে যাওয়া অংশ সংস্কার করে রূপনারায়ণে জল বের করার বন্দোবস্ত করতে হবে। অন্যথায় কৃষকরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ছাত্র কনভেনশন

একের পাতার পর

আন্দোলনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সর্বভারতীয় কমিটির সহ-সভাপতি কমরেড প্রোজ্জ্বল দেব।

কনভেনশনে মূল প্রস্তাব পেশ করেন সংগঠনের আসাম রাজ্য সম্পাদক ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশিষ্ট ছাত্রনেতা কমরেড হেমন্ত পেগু। ডক্টর ঘনশ্যাম নাথ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, গুয়াহাটি কমার্স কলেজ, মেঘালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ওয়ান্ডেল পাসাহ, আসামের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী অধ্যাপিকা চন্দ্রলেখা দাস, মণিপুরের শিক্ষক আন্দোলনের নেতা টি রামেশ্বর সিং, নর্থ ইস্ট হিল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এস শ্রীকান্ত, ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক এ

অধ্যাপক ওয়ান্ডেল পাসাহ

সৎপথী মূল প্রস্তাবের পক্ষে তাঁদের সম্পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে উত্তর-পূর্ব ভারতের জনশিক্ষার করুণ পরিস্থিতি তুলে ধরেন ও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হতে ছাত্রসমাজের কাছে আবেদন জানান। ডাঃ তপোধীর ভট্টাচার্য, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, অডিও রেকর্ডিয়ে তাঁর সংহতি-বার্তা পাঠান। এরপর মণিপুর স্টুডেন্ট ফ্রন্ট (এমএসএফ), এমওয়াইএসএফ-এর প্রতিনিধিরা এবং বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা অন্যান্য ছাত্র প্রতিনিধিরা তাঁদের মতামত তুলে ধরেন। তাঁরা সকলেই ছাত্রবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০-

শিক্ষক নেতা টি রামেশ্বর সিং

র বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নেন। সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক, গণতান্ত্রিক ধারণার উপর শাসক শ্রেণির আক্রমণের উদ্দেশ্য ও চরিত্র তুলে ধরেন। তিনি দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলনকে বেগবান করতে আন্দোলনের হাতিয়ার ছাত্রকমিটি স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের আহ্বান জানান। উত্তর-পূর্ব ভারতের শিক্ষাগত সমস্যা সম্পর্কে প্রতিনিধিদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁদের আবেগময় লোকসংস্কৃতির উপস্থাপনা শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং মানবতা রক্ষার্থে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০-র বিরুদ্ধে বৃহত্তর সংগ্রামের অভূতপূর্ব সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

৬ ডিসেম্বর কালাদিবস পালন

৬ ডিসেম্বর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এক শপথ অনুষ্ঠান হয় কলকাতার রবীন্দ্র সদনের পাশে রাণুচ্ছায়া মঞ্চে। শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন জনঅধিকার রক্ষা আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটকর, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা আন্দোলনের নেতা সুজাত ভদ্র, মঞ্চের রাজ্য সভাপতি দিলীপ চক্রবর্তী, গণআন্দোলনের নেতা অধ্যাপক তরুণ নস্কর প্রমুখ।

বাঁকুড়ায় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সভা

৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে দেশ জুড়ে কালাদিবস উদযাপিত হয়। বাঁকুড়া জেলার মাচানতলায় নেতাজি মূর্তির পাদদেশে পথসভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলা কমিটির সম্পাদক, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয়দেব পাল। সোনামুখীতে ট্যাবলো সহ শহর পরিক্রমা করে গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে ধিক্কার সভা হয়। বক্তব্য রাখেন দলের জেলা কমিটির সদস্য স্বপন নাগ, এআইডিএসও-র পক্ষে সিদ্ধার্থ ঘাঁটা, রনিতা পড়িয়া, অভ্রনীল মণ্ডল, তমা গোপ প্রমুখ। পার্টির এ সংক্রান্ত প্রচারপত্রও বিলি করা হয়।

সংকট গভীর বুঝেই উদ্ভট দাওয়াই অর্থমন্ত্রীর

মাত্র কিছুদিন আগেই ভারতের অর্থমন্ত্রীর মুখে একটি অসাধারণ তত্ত্ব শুনেছেন দেশবাসী। আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাঙ্কের ‘ডেভেলপমেন্ট কমিটি’-র সভায় যোগ দিয়ে তিনি বলেছিলেন, টাকার দাম কমেনি। ডলারের দামটা বেড়ে যাওয়ার ফলে টাকাকে কমদামী মনে হচ্ছে। তিনি প্রবল আস্ফালন করে বলেছেন, বিশ্ব জুড়ে চরম ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সংকট সত্ত্বেও ভারতের অর্থনীতি খুব শক্তিশালী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভারতের অর্থনীতির মূল বিষয়গুলি এতটাই বলবান যে কোনও সংকটই তাকে ছুঁতে পারবে না।

অথচ, দেশের মানুষ তাঁদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন এ আস্ফালন কতবড় মিথ্যা। মূল্যবৃদ্ধির চড়া হার, মানুষের প্রকৃত আয় ক্রমাগত কমতে থাকা, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং আর্থিক বৃদ্ধির নিম্নগামিতা আর যাই হোক কোনও অর্থনীতির শক্তিকে সূচিত করে না। বরং জনগণের শোচনীয় দশা বুঝিয়ে দেয় ভারতীয় অর্থনীতি কোন তলানিতে দাঁড়িয়ে আছে।

ভারত সরকারের রাজকোষ ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১৭ লক্ষ কোটি টাকার বেশি। এই ঘাটতির বেশিরভাগটাই হয়েছে বাজার থেকে নেওয়া ভারত সরকারের ঋণের কারণে। অর্থমন্ত্রীর সর্বশেষ বাজেট বক্তৃতা অনুযায়ী ভারত সরকারের ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৪.১ লক্ষ কোটি টাকা। যদিও গত ৩০ জুনের হিসাব অনুযায়ী ভারত সরকারের মোট ঋণ ৫০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। কেন্দ্রীয় সরকারের মোট রাজস্ব আদায়ের ৪৫ শতাংশই খরচ হয় এই ঋণের সুদ মেটাতে। এই ঋণ আরও বাড়ার আশঙ্কা সরকারই করছে। তাতে সুদের পরিমাণও বাড়বে, কমবে সরকারের খরচ করার মতো টাকার ভাণ্ডার। এর সাথে কমছে কর বহির্ভূত উৎস থেকে আসা সরকারের আয়।

কেন এই সংকট? সে প্রশ্ন উঠলেই অর্থমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভার সব সদস্য এবং তাঁদের পেটোয়া অর্থনীতিবিদ-আমলারা কয়েকটি কারণের সাফাই ফাটা রেকর্ডের মতো বাজাতে থাকেন— বিশ্ববাজারের অস্থিরতা, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ, তেলের চড়া দর, ডলারের তুলনায় টাকার দামের পতন ইত্যাদি। অর্থাৎ যেন কেবলমাত্র বাইরের কিছু বিষয়ের প্রভাবের জন্যই ভারতীয় অর্থনীতি এবং জনগণের দুর্দশা বাড়ছে। কিন্তু সত্যিই কিছু বাইরের কারণই জনগণের দুর্দশার জন্য একমাত্র দায়ী! বাস্তব কিন্তু তা বলে না, পুঁজিবাদের বিশ্বজোড়া সংকটের কিছু প্রভাব ভারতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পড়বেই। কিন্তু সেটাই সব নয়। ভারতীয় ধনকুবেরদের সীমাহীন শোষণের পথ করে দিতে ভারত সরকার জনগণের সাথে যে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা পালন করছে তা জনগণের দুর্দশা আরও বাড়িয়েছে। প্রতিদিন নানা সংস্থার সমীক্ষা এবং শহর গ্রামের বাস্তব চিত্র দেখাচ্ছে বিরাট সংখ্যক মানুষ দু’মুঠো ভাতের সংস্থান করতেই এমন নাজেহাল যে মাছ ডিমের মতো পুষ্টিকর খাবার তো দূরের কথা এক পাতা শ্যাম্পু বা একটা সাবান কিনতেও ইতস্তত করছে। রোজগার নেই, কাজের কোনও নিশ্চয়তা নেই, বহু রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের টাকাও মিলছে না। ক্ষুধা অপুষ্টির সূচকে ভারতে স্থান হয়েছে একেবারে নিচের সারিতেই। অথচ এর মধ্যেই

বুর্জোয়া অর্থনীতির ভাষাতেই ভারতের আজকের পরিস্থিতিকে বলা যেতে পারে ‘স্ট্যাগফ্লেশন’ অর্থাৎ মন্দা, অর্থনীতির অচলাবস্থা ও মুদ্রাস্ফীতির মিশ্রণে তৈরি এক সম্পূর্ণ অচল দশা। ভারতের অর্থমন্ত্রী কিংবা তাঁদের স্নেহধন্য বুর্জোয়া অর্থনীতির পণ্ডিতরা যে সত্যটা স্বীকার করতে ভয় পান—তা হল কোনও টোটকাতেই মরণের পথে চলা আজকের পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকটের রোগ কাটার নয়।

দেশের একদল ধনকুবেরের সম্পদ বিপুল হারে বেড়ে চলেছে। দেশের একচেটিয়া মালিকদের মুনাফাকে নিশ্চিত করা শুধু নয়, তা ক্রমাগত যাতে বেড়ে চলতে পারে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ থেকে শুরু করে কর্পোরেট সংবাদমাধ্যমের কলমচিরা বলেন, সরকার জনগণকে এখনও যতটুকু ছিটেফোঁটা ভর্তুকি দেয়, ১০০ দিনের কাজ বা স্বাস্থ্য-শিক্ষায় যে সামান্য টাকা খরচ করে, সেটাই রাজস্ব ঘাটতির কারণ। অথচ বাস্তব হল কেন্দ্রীয় সরকার জিএসটি এবং অন্য মাধ্যমে জনগণের ঘাড় ভেঙে যত পরোক্ষ কর, সেস ইত্যাদি আদায় করে থাকে তার থেকে অনেক বেশি তারা ছাড় দেয় কর্পোরেট ট্যাক্সে, পুঁজিপতিদের প্রত্যক্ষ করে। বৃহৎ পুঁজিপতিরা ব্যাঙ্কের থেকে নেওয়া লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে মেরে দিলে কেন্দ্রীয় সরকার তা আদায় করার চেষ্টার বদলে ব্যাঙ্কের খাতা থেকে তা মুছে দিয়ে সেই টাকা সরকারি কোষাগার থেকে মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। জনগণের জন্য পেট্রল-ডিজেল-কেরোসিন-গ্যাসে যতটুকু সরকারি ভর্তুকি বরাদ্দ ছিল তাও বন্ধ। স্বাস্থ্য-শিক্ষা থেকে শুরু করে জনকল্যাণমূলক খাতে সরকার ক্রমাগত বরাদ্দ কমাচ্ছে। করোনা মাহামারির সময়েও কেন্দ্রীয় সরকার প্যাকেজের নামে বিপুল অর্থ দিয়েছে বৃহৎ পুঁজিপতিদের, অথচ সাধারণ মানুষের রোজগারহীনতায় ক্ষতিপূরণ দিতে, পরিযায়ী শ্রমিকদের সুষ্ঠভাবে খাদ্য এবং আশ্রয় দিতে, তাদের ঘরে ফেরাতে এক টাকাও বরাদ্দ করেনি। বিনামূল্যে কিছুদিন রেশনে চাল-গম দেওয়ার কথা বললেও ক্রমাগত তার পরিমাণ কমছে শুধু তা নয় সরকার বন্ধ করে দেওয়ারও কথা বলছে।

অর্থমন্ত্রী যতই আশার বাণী শোনান না কেন তাঁরও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ ভয়াবহ। গত এক বছরে ভোজ্য তেল, চাল, গম, চিনি, আটা ইত্যাদির যে পরিমাণ দাম বেড়েছে তা অতীতের সমস্ত মূল্যবৃদ্ধির রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। ভোজ্য তেলের মূল্য ১৪০ শতাংশ বাড়ার পর মাত্র ৯ শতাংশ কমতেই সরকার দাবি করছে দাম কমছে। খাদ্য ছাড়াও জনগণের অতিপ্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রীর দাম বেড়েছে আকাশছোঁয়া। ওষুধ এবং চিকিৎসা সরঞ্জামের দাম যা বেড়েছে তাতে কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষে চিকিৎসা করানোই বিরাট বিলাসিতার সামিল। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কয়েক দফায় সুদ বাড়িয়ে দাবি করছে এই পথে মূল্যবৃদ্ধি কমবে। বুর্জোয়া অর্থনীতির টেক্সটবই তুলে ধরে সরকারের নীতিনির্ধারকরা বলছেন, এর ফলে মানুষ খরচ কমিয়ে বেশি সঞ্চয় করবে।

বইতে লেখা আছে মানুষের হাতে বেশি টাকা থাকলে তারা বেশি জিনিস কেনে, ফলে চাহিদা বাড়ে এবং মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। আজকের ভারতের অবস্থা কি তাই? বাস্তব পরিস্থিতি হল মানুষের হাতে কেনার মতো টাকাই নেই। বেশি জিনিস কিনবে কি সামান্য দরকারি জিনিসই অধিকাংশ মানুষ কিনতে পারছে না। মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া মালিকের সুপার প্রফিটের লালসা চরিতার্থ করার জন্য। বুর্জোয়া অর্থনীতির ভাষাতেই ভারতের আজকের পরিস্থিতিকে বলা যেতে পারে ‘স্ট্যাগফ্লেশন’ অর্থাৎ মন্দা, অর্থনীতির অচলাবস্থা ও মুদ্রাস্ফীতির মিশ্রণে তৈরি এক সম্পূর্ণ অচল দশা। ভারতের অর্থমন্ত্রী কিংবা তাঁদের স্নেহধন্য বুর্জোয়া অর্থনীতির পণ্ডিতরা যে সত্যটা স্বীকার করতে ভয় পান—তা হল কোনও টোটকাতেই মরণের পথে চলা আজকের পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকটের রোগ কাটার নয়। আর এই সত্যটা জানেন বলেই অর্থমন্ত্রী আইএমএফ-বিশ্বব্যাঙ্কের সভায় সংকট মোচনের উদ্ভট কিছু দাওয়াইয়ের কথা আওড়েছেন। তিনি বলেছেন, করোনা ভ্যাকসিনের উৎপাদন ও বেশি লোককে তা দিতে পারা, ডিজিটাল মাধ্যমে লেনদেন ও সুবিধা প্রদান বাড়ানো, জ্বালানি তেলের ওপর কিছুটা শুল্ক কমানো ইত্যাদি পদক্ষেপের ফলেই ভারত সংকট কাটিয়ে উঠতে চলেছে। অর্থমন্ত্রী তাঁর প্রধানমন্ত্রীর মতোই ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে অবান্তর কথা বলে আসল বিষয় থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার কায়দা ভালই রপ্ত করেছেন সন্দেহ নেই।

যে কোনও বুর্জোয়া ক্ষমতাসীন দলের মতোই বিজেপি পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস হিসাবেই কাজ করছে। তাদের সরকার পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনৈতিক ম্যানেজার। পুঁজিবাদের সংকট যত বাড়ছে তত বাড়ছে তার নিষ্ঠুর শোষণের মাত্রা। বিজেপির সরকার তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়িয়ে চলেছে দেশের সাধারণ মানষের ওপর তার আক্রমণ। অর্থমন্ত্রী জানতেন তিনি আইএমএফ-বিশ্বব্যাঙ্কের যে সব ঝানু আমলা ও শিল্পপতিদের সামনে বক্তব্য রাখছিলেন, তারা এই সব বাগাড়ম্বরের আসল মানে ঠিক বোঝে। তারা বুঝে নেবে দেশের মানুষকে অবাধ শোষণের ছাড়পত্র দিতে, মানুষকে রক্তশূন্য করে দিতে যে কোনও পদক্ষেপে বিজেপি সরকার পিছপা নয়। বিনিয়োগের নামে পুঁজিপতিরা শোষণ মৃগয়ায় যত মাতবে তত ভরে উঠবে বিজেপির ওপর পুঁজিপতিদের আশীর্বাদের ঝুলি। আজকের দিনে মানুষের কল্যাণ নয় পুঁজিপতি শ্রেণির আশীর্বাদই সরকারি গদিলাভের একমাত্র নিশ্চিত রাস্তা। তাই মিথ্যার ঝুড়ি খুলে ধরতে অর্থমন্ত্রীর লজ্জাবোধ হয়নি। কিন্তু বাস্তবের আঘাতে জর্জরিত মানুষ এ মিথ্যাকে একদিন চিনবেই।

বিহারে অ্যানাস্থেশিয়া ছাড়াই টিউবেকটমি

তীব্র নিন্দা এআইএমএসএস-এর

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড ছবি মোহান্তি, বিহারের দুটি হাসপাতালে অ্যানাস্থেশিয়া ছাড়াই টিউবেকটমির অস্ত্রোপচারের নিন্দা করে ৮ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, বিহারের খাগারিয়া জেলার দুটি সরকারি হাসপাতালে ২৪ জন মহিলার অ্যানাস্থেশিয়া ছাড়াই টিউবেক্টমি করায় তাঁরা অসহ্য শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়েছেন। এ ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

আমাদের মতো পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিশেষ করে পুত্র সন্তান লাভের আশায় পরিবারগুলি নারীদের বারবার গর্ভধারণের যন্ত্রণা সহ্য করতে বাধ্য করে। পরিবার পরিকল্পনার মূল দায়টাও মহিলাদের উপরেই চাপায়। এই যখন পরিস্থিতি তখন যে সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এত প্রচার করে, তাদের উচিত মহিলাদের জন্য অন্তত নিরাপদ ও ব্যথাহীন অস্ত্রোপচার নিশ্চিত করা। তা না হওয়ায় মহিলাদের অসুস্থতা ও মৃত্যুহার অনেকটাই বেড়ে যায়। বিহারের স্বাস্থ্য আধিকারিকরা মহিলাদের উপর এই চরম অবহেলার মনোভাব ঢাকতে নানা অজুহাত দিয়েছেন।

নিরাপদ ও শক্তিশালী অ্যানাস্থেশিয়া থাকা সত্ত্বেও যে চিকিৎসকরা অমানবিক ভাবে মহিলাদের এই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে বাধ্য করেছেন, এআইএমএসএস তাঁদের তীব্র নিন্দা করেছে। সংগঠন প্রশ্ন তুলেছে, অ্যানাস্থেশিয়ার ওষুধও কি মহিলাদের দিতে অক্ষম সরকার? বিহার রাজ্য সরকারের কাছে এআইএমএসএস অবিলম্বে দোষীদের বিচার ও তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিবেকবান সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে নারীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে যে, দেশের প্রত্যন্ত কোণেও মহিলা সহ সমস্ত নাগরিকের নিরাপদ স্বাস্থ্য-সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারের কাছে দাবি তুলুন।

ভাণ্ডারে উপচে পড়া খাদ্য তবু দেশে এত মানুষ ক্ষুধার্ত

ক্ষুধা নিয়ে ভারতে যত গবেষণা হয়েছে, তার যত রিপোর্ট বেরিয়েছে, পর পর রাখলে বোধহয় চাঁদে পৌঁছে যাওয়া যায়। প্রতি বছর নানা জাতীয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা এইসব রিপোর্ট বের করে। তাতে বারে বারে দারিদ্রের ভয়াবহ চিত্রই উঠে আসে। দেখা যায়, দারিদ্র ক্রমাগত বাড়ছে, অপুষ্টি বাড়ছে, শিশু, প্রসূতি মায়ের মৃত্যুও ক্রমাগত বাড়ছে। তারপর কী হয়?

এমন খবরে যেখানে সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের লজ্জায় অধোবদন হওয়া উচিত, নিজেদের অপদার্থতায় আত্মগ্লানিতে ভোগা উচিত, দারিদ্র-অপুষ্টি দূর করতে কোমর বেঁধে নামার কথা ঘোষণা করা উচিত, সেখানে শোনামাত্র তাঁরা রিপোর্ট অস্বীকার করতে থাকেন। বলেন, এ সব ভুল রিপোর্ট। ভুল পদ্ধতিতে তৈরি এবং অবশ্যই সরকারের দুর্নাম করার উদ্দেশ্যেই এমন রিপোর্ট বানানো হয়েছে— ঠিক যেমন এবারের বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের রিপোর্টে ভারতের দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠতে দেখে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মন্ত্রীরা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, বাস্তবে এমন কোনও পরিস্থিতিই নেই, দেশে ক্ষুধার অস্তিত্বই নেই। যেন শুধু সবটাই কৌশল, শুধু পদ্ধতির খেলা!

২০১৪ সালে ১০১টি দেশের ক্ষুধা তালিকায় ভারতের জায়গা হয়েছিল ৫৫ নম্বরে। ২০২০তে ৯৪। ২০২১-এ ১১৬টি দেশের মধ্যে ১০১-এ। এবার ২০২২-এ ১২১টি দেশের মধ্যে ভারত ১০৭ নম্বরে। অর্থাৎ একের পর এক রিপোর্ট বেরোচ্ছে, ক্ষুধা তালিকায় ভারত ক্রমশ খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে নেমে চলেছে। তার মানে, ক্ষুধা, অপুষ্টি, দারিদ্র যতই বাড়ুক, যতই তা কেউ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিক, তাতে শাসকদের কিছু যায় আসে না। তারা নির্বিকার। কারণ তারা জানে, এই কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষ দলবেঁধে তাদের কাছে খাদ্য চাইতে আসবে না, তাদের খাদ্য জোগাতে বাধ্য করবে না। কিংবা খাদ্য না পেলে খাদ্যভাণ্ডার লুঠ করার কথা ভাববে না। এমন আত্মবিশ্বাসের কারণ মানুষকে তারা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে।

ক্ষুধা সংক্রান্ত রিপোর্টগুলিতে কী থাকে? থাকে ক্ষুধার চরিত্র বর্ণনা, ক্ষুধার ফল বর্ণনা। এই যেমন এবারের রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, দেশের মানুষের ১৬.৩ শতাংশ তথা ২২.৪ কোটি মানুষ অপুষ্টির শিকার। ১৯.৩ শতাংশ শিশুর ওজন উচ্চতার তুলনায় কম। ৩৩.৫ শতাংশ শিশুর বয়সের তুলনায় উচ্চতা কম। কিন্তু এইসব রিপোর্টে বলা থাকে না কেন এই অপুষ্টি? প্রয়োজনীয় পরিমাণ পুষ্টি তারা কেন পায় না? দেশে কি খাদ্যের উৎপাদন কম হয়েছে? খাদ্যের মজুত কম হয়েছে? বাস্তবটা মোটেও তা নয়। বরং দেশবাসীর মোট প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন অনেক বেশি। তবুও কেন স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও বিপুল পরিমাণ দেশবাসী অর্ধাহারে-অনাহারে থাকে? মাথার উপর ছাদ পায় না? রোগে ওষুধ পায় না? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা এসব রিপোর্টে থাকে না।

২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর আনন্দবাজারে প্রকাশিত একটি খবরে দেখা যাচ্ছে, সরকারের গুদামে চাল সহ বিভিন্ন খাদ্যশস্য উপচে পড়ছে। আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য 'বাফার স্টকে' যে পরিমাণ চাল থাকা জরুরি, সরকারি গুদামে মজুত রয়েছে তার প্রায় দ্বিগুণ। এই খাদ্য দেশের ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কোনও চেষ্টা সরকার করেনি। পরিবর্তে মদ কোম্পানিগুলিকে সরকার বিপুল পরিমাণ শস্য দিয়ে দিচ্ছে ইথানল তৈরির জন্য। এতদিন পর্যন্ত আখের রস এবং গুড় থেকেই যে ইথানল তৈরি হত, ওই খবর অনুযায়ী সরকারি পরিকল্পনায় ১৭৫ লক্ষ টন চাল-গম-ভুট্টা-বার্লির মতো খাদ্যশস্য দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই ইথানল তৈরির জন্য। মদের প্রসার ঘটিয়ে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য খাদ্য চাল-গমকে ইথানল তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ-ই হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরিত্র। এখানে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য মজুত থাকলেও কোটি কোটি মানুষকে ক্ষুধার্ত থাকতে হয়। কারণ খাদ্য এখানে মুনাফার পণ্য, জীবনধারণের অপরিহার্য দ্রব্য নয়। খাদ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে মজুত থাকলেও তা কেনার ক্ষমতা যেহেতু ক্ষুধার্ত মানুষের থাকে না, তাই তাকে অনাহারেই থাকতে হয়।

একদল গবেষক আবার ক্ষুধা এবং দারিদ্রকে আলাদা করে অপুষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করছেন। এমন ব্যাখ্যা শাসকদের দ্বারা খুব প্রশংসিতও হচ্ছে। হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ এর দ্বারা ক্ষুধার আসল কারণটিকে আড়াল করে ক্ষুধার্ত মানুষের উপরেই তার দায় চাপিয়ে দেওয়া যায়। এই পণ্ডিতদের বক্তব্য, এই ক্ষুধা, এই অপুষ্টির কারণ দারিদ্র নয়। কারণ, দরিদ্র মানুষ নাকি হাতে পয়সা পেলে খাবার কেনার আগে মোবাইল, কেবল টিভির পিছনে খরচ করে। তারা নাকি খাবার না কিনে আগে শ্যাম্পু কেনে। কে নাকি এই গবেষকদের বলেছে, 'রোজ একটা ডিম খেলাম কি না সেটা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু শ্যাম্পু করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।' অর্থাৎ এই যাদের মানসিকতা তাদের তো অপুষ্টি হবেই! সরকার আর কী করবে! ধনীর সন্তানের খাদ্যগ্রহণে অনীহার কারণে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যাওয়ার উদাহরণ টেনে এনে এঁরা দরিদ্রের সন্তানের অনাহারের অপুষ্টিকে ব্যাখ্যা করেন! উদোর দায় বুদোর ঘাড়ে ফেলা আর কাকে বলে! গরিব মানুষ যদি সত্যি অসচেতনই হন, তাঁদের এই অসচেতনতার দায় কি সরকার এবং মিডিয়া হাউসগুলোর উপরও বর্তায় না? সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা জাগাতে না পারলে তারা এতদিন কী করেছেন? তার চেয়েও বড় কথা এবং আসল কথা, গরিব মানুষকে ডিম এবং শ্যাম্পুর মধ্যে যে কোনও একটা বেছে নিতে হবে কেন? কেন তাদের মোবাইল খরচ, কেবলের খরচ মেটানোর পর খাবারের খরচ অবশিষ্ট থাকবে না? যখন এক একটা নির্বাচন আসে, পাতা জোড়া, রাস্তা জোড়া বিজ্ঞাপনে এবং বক্তৃতায় এঁরা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেন, জনগণের সব দুঃখ-দুর্দশা দূর করে উন্নয়নে মুড়ে দেওয়ার গল্প শোনান। আর ভোট চলে গেলে তখন দারিদ্র, অপুষ্টি-ক্ষুধার দায় হয়ে যায় জনগণের! তাদের বোঝানো হয়— তোমরা সচেতন নও, তোমাদের পুষ্টি-অপুষ্টি জ্ঞান নেই, তোমরা নিজেদের ভাল নিজেরা বোঝ না। তোমাদের ভাল কে করবে! শাসকের এই চালাকি অবশ্য নতুন নয়। স্বাধীনতার বছর কয়েক আগে যখন বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখনও সিনেমা হলের সামনে ভিড় দেখিয়ে ব্রিটিশ শাসকের তাঁবেদার একদল লোক 'কোথায় অভাব, মানুষ দিব্যি সিনেমা দেখছে' গোছের যুক্তি করার চেষ্টা করতেন। শাসকের রঙ বদলেছে, ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।

কেউ কেউ আর একটু ভারিক্কি চালে বলেন। এই ক্ষুধা-অপুষ্টির জন্য তাঁরা দায়ী করেন সামাজিক অসাম্য, অসম বন্টন, সরকারি নীতির ব্যর্থতাকে। অর্থাৎ সরকারের সদিচ্ছা বা নীতিতে গলদ নেই, যা-কিছু গলদ বা ব্যর্থতা তা ওই নীতি কার্যকর করাতেই। যেন সামাজিক অসাম্য আকাশ থেকে পড়া কোনও বিষয়! সম্পদের অসম বন্টন যেন নিয়তির খেলা! অর্থাৎ সমীক্ষা, গবেষণা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যা-ই হোক না কেন, সবেরই উদ্দেশ্য আসলে নানা অজুহাতকে যুক্তির মোড়কে সাজিয়ে পরিবেশন করা। স্বভাবতই সংবাদপত্রে, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এ-সব ফলাও করে প্রচার করা হয়। যাতে সযত্নে আড়াল করা যায় ক্রমবর্ধমান অনাহার-অর্ধাহারের আসল কারণ এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে— ব্যক্তিমালিকানা এবং শোষণই যে-ব্যবস্থার ভিত্তি, যে-ব্যবস্থায় অন্যের শ্রম চুরি করা ন্যায্য এবং আইনসঙ্গত। অতিমারিতে যখন কোটি কোটি মানুষ গরু-ছাগলের মতো বিনা চিকিৎসায়, বিনা ওষুধে মরে, কোটি কোটি মানুষ লকডাউনে কাজ হারিয়ে পরিবার নিয়ে পথে বসে ঠিক তখনই এই ব্যবস্থার গুণে একদল পুঁজিপতি অবিশ্বাস্য রকমের মুনাফা করে। অর্থাৎ বেশির ভাগ মানুষকে অনাহারে রেখে মুষ্টিমেয় মালিকের মুনাফা করার মতো সমস্ত সুযোগ এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তৈরি করে রেখেছে। এই অন্যায় বৈষম্যই শাসক শ্রেণির বেঁচে থাকার উৎস। এর উপরই নির্ভর করে আছে তাদের অস্তিত্ব, সম্পদ, ঐশ্বর্য, যাবতীয় ভোগ-বিলাস। অন্যের শ্রম চুরি করে যেমন তাদের মুনাফা, তেমনই বিরাট একটা সংখ্যায় মানুষকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করে, ক্ষুধার্ত রেখেই তাদের সম্পদ-বৈভব। তাই ক্ষুধার্ত মানুষের দিকে কখনও কিছু খুদ-কুঁড়ো ছুঁড়ে দিলেও এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ ক্ষুধা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার, পুঁজিপতি শ্রেণির অস্তিত্বের সঙ্গেই তা জড়িয়ে রয়েছে।

ক্ষুধার্ত মানুষকে আজ পরিষ্কার বুঝে নিতে হবে, ক্ষুধার কারণ হিসাবে শাসকরা যত কারণই দেখাক, তার আসল কারণটি যে শোষক-শোষিতে বিভক্ত এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, তা তারা কখনওই প্রকাশ হতে দেবে না। তাই ক্ষুধা নিয়ে যত তথ্য, যত করুণ রিপোর্টই সামনে আসুক, শাসকের অন্যায় শোষণ, অপশাসনের গায়ে তা একটি আঁচড়ও কাটতে পারে না। এই কারণেই সাম্প্রতিক ক্ষুধা-রিপোর্টে শিশুদের মর্মান্তিক চিত্র প্রকাশ পাওয়ার পরেও মিড ডে মিল প্রকল্পে প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরে জন প্রতি বরাদ্দ ৪৮ ও ৭২ পয়সার মতো লজ্জাজনক পরিমাণে বাড়াতে শাসকদের হাত কাঁপেনি। কোটি কোটি মানুষকে ক্ষুধার্ত রেখে লক্ষ লক্ষ টন চাল-গম-বার্লি মদ কোম্পানিগুলির হাতে তুলে দেওয়ার মতো অমানবিক কাজ তারা অনায়াসে করতে পেরেছে। কাজেই এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আড়াল করে, একে সমূলে উৎপাটন না করে দারিদ্র-অপুষ্টি-অনাহার কমানোর কোনও বাস্তব পথ মানুষের সামনে নেই। এই ব্যবস্থা যতদিন অটুট থাকবে, ততদিন সমাজে ক্ষুধাও থাকবে শুধু নয়, ক্রমশ বাড়বে অনাহারে মৃত্যু, ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা। যদি শাসকদের থেকে সামান্য দাবিও আদায় করতে হয় তবে তা ক্ষুধার্ত মানুষের, শোষিত মানুষের সংগঠিত প্রবল গণআন্দোলনের দ্বারাই একমাত্র সম্ভব।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে অর্থ বরাদ্দ কই? বিক্ষোভ দুই মেদিনীপুরে

লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে ৮ ডিসেম্বর জলশক্তি মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী যে উত্তর দিয়েছেন, তা থেকে জানা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে কোনও অর্থ বরাদ্দ করেনি। কেন্দ্রীয় জলসম্পদ দপ্তরের অ্যাডভাইসারি কমিটি ৬ জুন ২০১৮ তারিখে ১৩৬ তম মিটিং-এ এই স্কিমটিকে অনুমোদন করেছে। যার প্রথম দফায় ধরা হয়েছে ১২৩৮ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা (২০১৭ সালের মূল্য অনুসারে)। পরবর্তী ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্ট ক্লিয়ারেন্স কমিটি চলতি বছরের ১০ জুন ১৭তম মিটিংয়ে ওই প্ল্যানের জন্য ছাড়পত্র দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দেবাশীষ মাইতি বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তেরোটি ব্লকের স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণে প্রায় ১৭ লক্ষ অধিবাসীকে ফি বছরের বন্যার হাত থেকে মুক্তি দিতে তৈরি বহু প্রতীক্ষিত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার নানা অজুহাতে টালবাহানা করে এখনও পর্যন্ত কোনও অর্থ বরাদ্দ করছে না। ফলে দুই জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর বর্ষার সময় সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এই মাস্টার প্ল্যানে যাতে অর্থ মঞ্জুর করে আগামী বর্ষার আগে কাজ শুরু করে, সে জন্য আমরা উভয় সরকারের নিকট দাবি জানাচ্ছি।

অতি দ্রুত উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে দুই মেদিনীপুর জেলার ভুক্তভোগী মানুষেরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে বলে কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

আবাস যোজনার সার্ভের কাজে আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিয়োগ অবৈধ
এ আই ইউ টি ইউ সি

আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দিয়ে এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ কেন করানো হচ্ছে, রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিবের কাছে এর জবাব চাইল এ আই ইউ টি ইউ সি। ১২ ডিসেম্বর নবান্নে সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যসচিবকে জানানো হয়, কেন্দ্রীয় শিশু ও নারী কল্যাণ দপ্তরের ২০০৮-এর ২৪ অক্টোবরের সার্কুলার অনুযায়ী, কর্মীদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন কোনও কাজ এঁদের দিয়ে করানো যায় না। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস প্রশ্ন করেন, এই সার্কুলার থাকা সত্ত্বেও কেন 'আবাস যোজনা প্লাস'-এর সার্ভের কাজে এই কর্মীদের নিযুক্ত করা হচ্ছে?

প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সহসভাপতি নন্দ পাত্র, আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক ইসমত আরা খাতুন এবং রাজ্য অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক মাধবী পণ্ডিত। তাঁরা জানান, ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশনের গাইড লাইনেও এই ধরনের কাজের কোনও উল্লেখ নেই।

আবাস যোজনায় ঘর পাওয়ার যে তালিকা তৈরি হয়েছে, তা সার্ভে করে কে যোগ্য কে নয় তা নির্ধারণ করতে বলা হচ্ছে আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। কর্মীদের বক্তব্য, এই কাজ করতে গিয়ে রাজনৈতিক চাপ ও নানা লাঞ্ছনার শিকার হতে হচ্ছে তাঁদের। তাঁরা জানান পাকা দোতলা-চারতলা বাড়ি আছে এমন লোকের নামও আবাস যোজনার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আবার খড়ের ঘরে বা ত্রিপল টাঙিয়ে কোনও রকমে মাথা গুঁজে থাকেন, এমন অনেকের নাম বাদ গেছে। বোঝাই যায় আবাস যোজনায় আর এক দুর্নীতির ইমারত তৈরি হয়ে আছে। এমনিতেই রাজ্যে নিয়োগ কেলেঙ্কারির মারাত্মক রূপ দেখে রাজ্যবাসীর ক্ষোভ প্রবল আকার নিয়েছে। নতুন কেলেঙ্কারি ঢাকা দিতেই কি আবাস যোজনার যোগ্যতা নির্ধারণের দায় আশা-অঙ্গনওয়াড়িদের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে?

এই কর্মীরা যে তালিকা নিয়ে ঘুরবেন, তা তৈরি করেছেন এলাকার পঞ্চায়েত প্রধানরা। তাঁরা কি এলাকার মানুষকে চেনেন না, নাকি কে এই যোজনায় ঘর পাওয়ার যোগ্য, কে নয় তার খোঁজ রাখেন না? তাঁরা যে সব অযোগ্যদের নাম তালিকায় যোগ করে রেখেছেন, তাদের বাদ দিতে গিয়ে আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা স্থানীয় প্রভাবশালীদের চাপের মুখে পড়লে তাঁদের নিরাপত্তা কে দেবে? ফলে রাজ্য জুড়ে দাবি উঠছে এ কাজ থেকে আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অব্যাহতি দেওয়া হোক।

রাজ্যের তৃণমূল সরকার বলছে, সার্ভে করতে গিয়ে এই কর্মীদের কেউ হেনস্থা করলে সরকার বরদাস্ত করবেনা। কিন্তু কর্মীরা প্রশ্ন তুলছেন, ইতিপূর্বে রেশন কার্ড সার্ভে, শৌচাগার সার্ভে করতে গিয়ে এই কর্মীরা যখন হেনস্থার মুখে পড়েছেন, রাজ্য সরকার ক'জন হেনস্থাকারীর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা জানাক।

আইসিডিএস কর্মীর মৃত্যু সরকারি নীতির ফল

আবাস যোজনায় সার্ভের কাজ করতে গিয়ে নানা চাপ সামলাতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগর ব্লকের আইসিডিএস কর্মী রেবা রায় বিশ্বাস। এই মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন এক বিবৃতিতে বলেন, শেষ পর্যন্ত আমাদের আশঙ্কা মর্মান্তিক ভাবে সত্য প্রমাণিত হল। আমরা বারবার দাবি করেছি যে, আবাস যোজনা প্লাসের সার্ভের কাজ থেকে আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অব্যাহতি দেওয়া হোক। এ প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্য সচিবকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের উপর ন্যস্ত কাজের সঙ্গে এই সার্ভের কাজ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই কাজ গ্রামে করতে গেলে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, চাপ এবং হুমকির মুখে পড়বেন। ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন জেলায় আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। পরিবারের উপর আক্রমণ হচ্ছে। অনেকের জমির ফসল নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তবুও সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী রেবা রায় বিশ্বাস এই চাপ ও হুমকি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। বাস্তবে সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই এই মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। এই অবস্থায় আমরা দাবি করছি, এই মৃত্যুর জন্য দায়ী প্রত্যেককে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে ও পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং পরিবারের একজনের চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে।

স্থায়ী সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সহ নানা দাবিতে বাঙ্গালোরে আশাকর্মী ইউনিয়নের সভা। ৩০ নভেম্বর

দলের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড পুষ্পেন্দ্রর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড পুষ্পেন্দ্র ৭ ডিসেম্বর রাতে প্রতাপগড়ে এক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। এত কম বয়সে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে উত্তরপ্রদেশে এস ইউ সি আই (সি) দল এবং বামপন্থী আন্দোলনের বড় ক্ষতি হল।

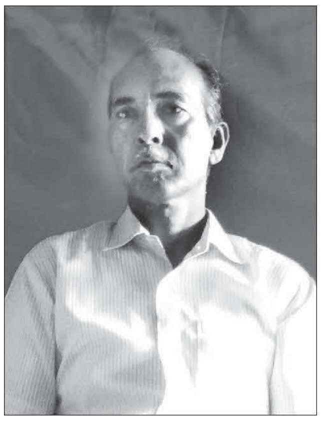

৯ ডিসেম্বর দলের প্রতাপগড় অফিসে রক্ত পতাকায় মোড়া তাঁর মরদেহ আনা হলে বহু নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ সেখানে সমবেত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে মাল্যদান করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী ও দলের রাজ্য নেতৃবৃন্দ এবং শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব, মহিলা ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতারা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। রক্তপতাকা হাতে নেতা-কর্মীরা মিছিল করে প্রয়াত রাজ্য সম্পাদকের মরদেহ শ্মশানে নিয়ে যান। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণে সঙ্গীত ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের পর তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। কমরেড পুষ্পেন্দ্রর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উত্তরপ্রদেশে দলের সমস্ত অফিসে সাত দিন রক্তপতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়, কমরেডরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন।

উত্তরপ্রদেশে এস ইউ সি আই (সি)-র পূর্বতন সম্পাদক প্রয়াত কমরেড বি এন সিং সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে হাতেগোনা যে কয়েকজনকে নিয়ে ওই রাজ্যে দলের কাজ শুরু করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কমরেড পুষ্পেন্দ্রর বাবা কমরেড চক্রবর্তী বিশ্বকর্মা। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দলের আদর্শ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

কমরেড পুষ্পেন্দ্র ছাত্রজীবনে এআইডিএসও-র কাজ শুরু করেন। ছাত্র সংগঠনে তিনি উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক এবং সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। দলের সর্বক্ষণের কর্মীর জীবন ছেড়ে পিছন ফিরে তাকানোর কথা তিনি ভাবেননি। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারার অনুশীলন ও উন্নত রুচি-সংস্কৃতি আয়ত্ত করার সংগ্রাম এবং বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে খুব কম বয়সেই দলের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক ও নেতায় পরিণত হন তিনি। ২০১৭-তে কমরেড পুষ্পেন্দ্র দলের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হন। মধুর স্বভাবের দ্বারা সবাইকে তিনি আপন করে নিতে পারতেন। পার্টি সংগঠনের যে কোনও সঙ্কট মোকাবিলায় তিনি তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে লড়েছেন। চেষ্টা করেছেন দলকে সমস্যা থেকে রক্ষা করে যেতে। রাজ্যের গণআন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যেমন নিয়েছেন তেমনই নিজের এলাকায় নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, জাতপাত-সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও এই নিয়ে হত্যার রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন। কমরেড পুষ্পেন্দ্র নিজের পরিবারের মধ্যেও দলের উন্নত আদর্শ ও সংস্কৃতি নিয়ে গেছেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরাও দলের কাজে যুক্ত হয়েছেন। তাঁর পুত্র দলের একজন সর্বক্ষণের কর্মী ও এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় কাউন্সিল সদস্য।

কমরেড পুষ্পেন্দ্রর মৃত্যুতে দল এক নির্ভরযোগ্য নেতাকে হারাল। এইরকম একজন বিপ্লবী কর্মীর আকস্মিক প্রয়াণে সৃষ্ট শূন্যতা মেটানো খুব সহজ নয়। তবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে উত্তরপ্রদেশে পার্টির নেতা ও কর্মীরা শোককে শক্তিতে পরিণত করবেন এবং কমরেড পুষ্পেন্দ্রর অভাব পূরণে দলের আদর্শ বুকে নিয়ে এক-মানুষের মতো দাঁড়াবেন, আরও বেশি দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবেন। এটাই হবে কমরেড পুষ্পেন্দ্রর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ্য।

কমরেড পুষ্পেন্দ্র লাল সেলাম

কমরেড পুষ্পেন্দ্রর শেষযাত্রায় অংশ নিয়েছেন শত শত মানুষ

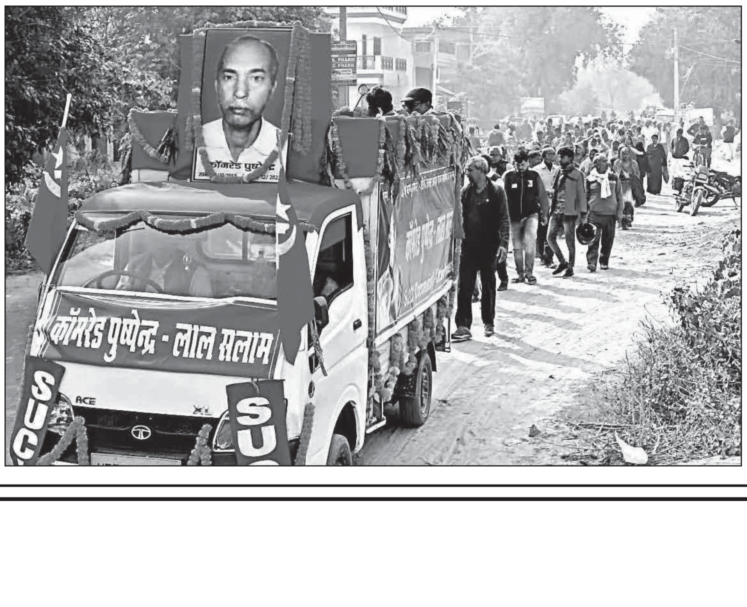

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

বিদ্যুতের লাইন কাটার হুমকি-সার্কুলার কর্ণাটকে
তীব্র প্রতিবাদ গ্রাহক কমিটির

কর্ণাটকের বাঙ্গালোর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এক সার্কুলারে বলেছে, পরপর তিনমাস বিদ্যুৎ বিল জমা না দিলে লাইন কেটে দেওয়া হবে এবং নতুন করে কানেকশন নিতে গেলে সব ফি আবার দিতে হবে। এই জনবিরোধী সার্কুলারের তীব্র বিরোধিতা করেছে কর্ণাটক ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন।

বিদ্যুৎগ্রাহকদের সর্বভারতীয় সংগঠন এআইইসিএ অনুমোদিত এই সংগঠনের বক্তব্য, চলতি অর্থবর্ষে তিনবার বিদ্যুৎ মাশুল বাড়ানো হয়েছে, যা মানুষের সহ্যসীমার বাইরে। এমনিতেই সাধারণ মানুষের আর্থিক পরিস্থিতি সঙ্গীন। জীবনযাপন খরচ প্রতিদিন বাড়ছে কিন্তু আয় সেই অনুপাতে কিছুই বাড়েনি। এই অবস্থায় বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়া মানে জনসাধারণকে চরম বিপদে ফেলা। শুধু সাধারণ মানুষই না, ক্ষুদ্র শিল্পও বিদ্যুৎ মাশুলের চাপে বিপর্যস্ত। তাঁরা দাবি করেন এই জনবিরোধী সার্কুলার প্রত্যাহার করতে হবে।

৬ ডিসেম্বর কলকাতায় ধিক্কার মিছিল

৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)এর নেতৃত্বে একটি প্রতিবাদ মিছিল এসপ্ল্যানেডে লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে রামলীলা পার্ক পর্যন্ত পৌঁছায়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন দলের পলিটবুরো সদস্য, রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য স্বপন ঘোষাল, কলকাতা জেলা সম্পাদক সুব্রত গৌড়ী, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নভেন্দু পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। রামলীলা পার্কে রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপি আরএসএস-এর সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শ্রমজীবী মানুষেরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে। ফলে মানুষের জীবনের দাবিগুলি পিছনে চলে যাচ্ছে। তাই শ্রমজীবী মানুষের দাবিগুলি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের পথেই সাম্প্রদায়িকতাকে রুখতে হবে। তিনি শ্রমিক কৃষকসহ সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে গণআন্দোলন গড়ে তুলে সাম্প্রদায়িকতাকে পরাস্ত করার জন্য আহ্বান জানান। ওই দিন রাজ্যের সব জেলা ও অন্য রাজ্যেও মিছিল, সভা ইত্যাদি হয়।

হারার ভয়ে নির্বাচন আটকাচ্ছে তৃণমূল

একের পাতার পর

কায়দায় এআইডিএসও-র হাতে পরাজয়ের আশঙ্কায় তৃণমূল সরকার ছাত্র সংসদ নির্বাচন বানচাল করেছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী মেডিকেল কলেজে পরাজিত হয়ে ভাবমূর্তি হারানোর আশঙ্কায় তারা একই কায়দার আশ্রয় নিচ্ছে।

স্বভাবতই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা ৫ ডিসেম্বর থেকেই কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করে রাখে। পরদিন সকাল থেকে দফায় দফায় সরকারের ধামাধরা নার্স, কর্মচারী সংগঠন এবং তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হাসপাতালের পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটার হাস্যকর অজুহাত তুলে আন্দোলন ভাঙতে চেষ্টা করে। সরকারের ধামাধরা মিডিয়া আন্দোলনের বিরুদ্ধেপ্রচার চালাতে থাকে। কিন্তু তাতে আন্দোলন ভাঙা যায়নি। শেষপর্যন্ত ৫ জন ছাত্র অনশনে বসেছে এবং বাকিরা অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছে। এআইডিএসও মেডিকেল কলেজ ইউনিটের ছাত্ররা আগাগোড়া আন্দোলনের সাথে যুক্ত রয়েছেন। শেষ পাওয়া খবর, একজন ছাত্র ইতিমধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

এআইডিএসও-র দাবি রাজ্য সরকার মেডিকেল কলেজগুলির স্বায়ত্তশাসনের উপর হস্তক্ষেপ বন্ধকরুক এবং অবিলম্বে ছাত্রদের দাবি মেনে নিয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘোষণা করুক। আন্দোলনকারী ছাত্রদের কোনও স্বাস্থ্যহানি ঘটলে তার জন্য দায়ী সম্পূর্ণ থাকবে রাজ্য সরকারের।

ঝাড়খণ্ডে ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিবস পালন

৩ ডিসেম্বর ঝাড়খণ্ডে এআইডিএসও-র জামশেদপুর শহর কমিটির উদ্যোগে শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিবস মর্যাদা সহকারে পালিত হয়। ক্ষুদিরাম চকের সভায় বহু ছাত্রছাত্রী যোগ দেন। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড সমর মাহাতো শহিদ মূর্তিতে মাল্যদান করে সভার সূচনা করেন। রাজ্য সহসভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও জেলা সম্পাদক, সভাপতিও উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও দিনটি পালিত হয়।

কাঁথিতে ক্ষুদিরাম স্মৃতি সংগ্রহশালার উদ্বোধন

অগ্নিযুগের বীর বিপ্লবী শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর ১৩৪তম জন্মদিন ৩ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের ঐতিহাসিক কাঁথি শহরে উদ্বোধন হল শহিদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি সংগ্রহশালা।

শহিদ-মূর্তির পাদদেশে ‘কন্টাই শহিদ ক্ষুদিরাম মেমোরিয়াল ট্রাস্ট’ ও সহযোগী সংস্থা ‘কাঁথি শহিদ ক্ষুদিরাম স্মৃতিরক্ষা সমিতি’র উদ্যোগে ক্ষুদিরাম বসুর জীবনের নানা ঘটনার খোদাই ও দুষ্প্রাপ্য ছবির আলোকচিত্র সংবলিত সংগ্রহশালার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী ডঃ মৃদুল দাস। উপস্থিত ছিলেন কাঁথি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমিত কুমার দে, অধ্যাপক প্রদীপ্ত পণ্ডাধ্যায়ী, শিল্পী অসিত সাঁই, দেবায়ন কর, সমিতির সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় প্রমুখ। বক্তারা শহিদের জীবনের নানা দিক তুলে ধরে আজকের অবক্ষয়িত সমাজে তাঁর জীবনসংগ্রামের যথার্থ অনুশীলনের আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি পৌরসভার পৌরপিতা সুবল কুমার মান্না। তিনি এই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্ট ও সমিতির সভাপতি দেব কুমার রায়।

স্মৃতি সংগ্রহশালা উদ্বোধন উপলক্ষে রোড রেস প্রতিযোগিতা, রক্তদান শিবির, শীতবস্ত্র প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

দর্শন বলতে কী বুঝি

তিনের পাতার পর

এরই মাধ্যমে মানুষ যাতে প্রকৃতিকে বুঝতে পারে এবং তাকে নিজের কাজে লাগাতে পারে এ ব্যাপারে সাহায্য করে। বিজ্ঞানের সব কিছু কাজ কারবার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু নিয়ে। বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান বস্তুর বিশেষ বিশেষ রূপের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে। কিন্তু বিজ্ঞানের কোনও বিশেষ শাখাই, ‘এই দুনিয়াটা কী রকম’, ‘বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কী? এই ধরনের তত্ত্বগত প্রশ্নের কিংবা ‘জীবনের উদ্দেশ্য কী?’, ‘মানুষের কর্তব্য কী’— এই ধরনের আনুসঙ্গিক নীতিগত প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিশেষ বিশেষ বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ সত্যের সন্ধান দিতে পারে কিন্তু সাধারণ ভাবে দুনিয়া সম্পর্কে বা জীবন সম্পর্কে কোনও সাধারণ সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। এই সব দার্শনিক তত্ত্বগত বা নীতিগত প্রশ্নের জবাব মানুষ তখনই পেতে পারে যখন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ বিশেষ সত্যগুলির মধ্যকার, সাধারণ যোগসূত্রটা খুঁজে বের করে তার ভিতর থেকে সে জগত সম্পর্কে, জীবন সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা গড়ে তুলতে পারে। এবং এই সামগ্রিক ধারণা, এই সাধারণ সত্যের উপলব্ধিই হচ্ছে দর্শন।

(এই নিবন্ধটি ১৯৬২ সালে গণদাবী ১৫ বর্ষ ৬ সংখ্যা থেকে ৯ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটির গুরুত্ব বিবেচনা করে পুনঃপ্রকাশ করা হল। এ বার প্রথম অংশ)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com